প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী যেভাবে গড়ে ওঠে

মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে আবিসিনিয়ায় হিজরত (অন্য দেশে আশ্রয়) করে সাহাবিদের একটি দল। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নৌ-অভিযান। এই অভিযান ছিল সম্পূর্ণ অসামরিক। পরবর্তী সময়ে আরব উপদ্বীপে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে সামরিক নৌবাহিনী গঠনের প্রয়োজন হয়। বিশেষত রোমান সাম্রাজ্যের আগ্রাসন রোধে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী অপরিহার্য ছিল ইসলামী খেলাফতের জন্য। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা.)-এর যুগে নৌবাহিনী গঠনের প্রথম প্রস্তাব দেন মুসলিম সেনাপতিরা। কিন্তু আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক স্থিতি সন্তোষজনক না হওয়ায় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মনে করতেন, পারস্য উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির আগে আরব উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজনৈতিক স্থিতি বেশি প্রয়োজন।

ওমর (রা.)-এর শাসনামলে আলা ইবনে হাদরামি প্রথম নৌবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেন। তিনি কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়াই একটি নৌবাহিনী গঠন করেন এবং পারস্যের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে এই অভিযান ব্যর্থ হয়। কেন্দ্রের অনুমতি না নিয়ে অভিযান চালানোয় ওমর (রা.) তাঁকে বরখাস্ত করেন। ওই অঞ্চলে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে নিযুক্ত করেন। এ সময় সিরিয়া ও পশ্চিম জর্দানের গভর্নর ছিলেন মুয়াবিয়া (রা.)। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের আগ্রাসনের আশঙ্কার কথা জানিয়ে নৌবাহিনী গঠনের অনুমতি চান। কিন্তু ওমর (রা.) তাঁর প্রস্তাবও নাকচ করেন। ড. আলী রুসান বলেন, ‘ওমর (রা.)-এর যুগে মুসলিম সীমান্ত মিসর, পারস্য ও সিরিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। এই বিশাল সীমানা সংরক্ষণ করতে মুসলিম বাহিনী হিমশিম খাচ্ছিল। তাই তিনি সমুদ্রে নতুন যুদ্ধক্ষেত্র খুলতে সম্মত হননি। এটা ওমর বিন খাত্তাবের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ।’
ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পর উসমান (রা.) মুসলিম বিশ্বের খলিফা হলে মুয়াবিয়া (রা.) আবারও নৌবাহিনী গঠনের অনুমতি চান। এরই মধ্যে রোমান সেনাপতি ম্যানুয়েলের নেতৃত্বে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় হামলা ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ফলে ইসলামী খেলাফতের নৌসীমা সংরক্ষণে নৌবাহিনী গঠনের দাবি আরো জোরালো হয়। তিনি

প্রতিরক্ষামূলক বাহিনী গঠনের অনুমতি দেন। অনুমতি পেয়ে মুয়াবিয়া (রা.) পূর্ণ উদ্যমে নৌবাহিনী গঠনে পূর্ণ মনোযোগ দেন। অল্পদিনেই একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনে সক্ষম হন। মুয়াবিয়া (রা.) নৌবাহিনী গড়ে তুলতে মিসর, শাম ও জর্দানের যুদ্ধ প্রকৌশলী নিয়োগ দেন। তৎকালে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিশেষভাবে দক্ষতার জন্য জর্দানের উপকূলীয় আকা অঞ্চলের মানুষের সুখ্যাতি ছিল। বাইজেন্টাইন সম্রাট এখানে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। মুয়াবিয়া (রা.)-ও জাহাজ নির্মাণের জন্য ওই অঞ্চলকে বেছে নেন। কারাবাসে প্রথম নৌ-অভিযানের জন্য তিনি আকা থেকেই যাত্রা শুরু করেন। এর কিছুদিন পর মিসর ও সিরিয়ায়ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বলেন, ‘বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের হুমকি মোকাবেলায় ইসলামী খেলাফতের নৌবাহিনী গঠনের বিকল্প ছিল না। কেননা মুসলিম সীমান্তজুড়ে রোমান বাহিনীর তৎপরতা মুসলিম সেনাপতিদের বিচলিত করে তুলছিল। শাম উপকূলেও রোমান বাহিনীর নৈরাজ্য বাড়ছিল দিন দিন।’

সীমানা রক্ষা ছাড়াও ইসলাম প্রচার, সিরিয়া ও মিসরের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ভূমধ্যসাগরে মুসলিম জাহাজের নিরাপত্তা, নৌ- বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, বাইজেন্টাইন সম্রাটের আধিপত্য হ্রাস করা ছিল মুসলিম নৌবাহিনী গঠনের অন্যতম লক্ষ্য।

২৭ হিজরিতে মুয়াবিয়া (রা.) তিউনিসিয়ার কারাবাস দ্বীপে প্রথম নৌ- অভিযান পরিচালনা করেন; যদিও এই অভিযানের জন্য তিনি বহু আগেই অনুমতি চান। উসমান (রা.) এই অভিযানের জন্য কয়েকটি শর্ত দেন; যেমন—মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, অভিযানে অংশগ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যাবে না, সিরিয়া উপকূলে মুসলিম বাহিনীকে সহযোগিতা করার মতো বাহিনী ও রসদ রেখে যাওয়া ইত্যাদি। মুয়াবিয়া (রা.) অভিযানে সফল হন। কারাবাস নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান ও বাইজেন্টাইন সম্রাটের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করার শর্তে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়। মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর স্ত্রী ছাড়াও এই অভিযানে মর্যাদাশীল অনেক সাহাবি অংশগ্রহণ করেন; যেমন—উবাদা বিন সামিত ও তাঁর স্ত্রী উম্মে হারাম (যাঁকে প্রথম নৌ-অভিযানে অংশগ্রহণের সুসংবাদ দেন মহানবী (সা.), আবু আইয়ুব আনসারি, আবু জর গিফারি, ফুজালা বিন উবাইদ আনসারি, উমরা বিন সাআদ, সাদ্দাদ বিন আউস, মিকদাদ (রা.) প্রমুখ।

কারাবাস বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী রোডস, আরওয়াদ ও কোচ

দ্বীপপুঞ্জ জয় করে ক্রেট ও ইতালির সিসিলি দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ক্রমবর্ধমান মুসলিম নৌশক্তি মোকাবেলার জন্য বাইজেন্টাইন সম্রাট যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে বর্তমান তুরস্কের আনাতোলিয়ার নিকটবর্তী ফিনিশিয়া নামক দ্বীপের কাছে ভূমধ্যসাগরে ২৭ আগস্ট ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটাই মুসলিম ইতিহাসের প্রথম নৌযুদ্ধ। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে ২০০ যুদ্ধজাহাজ অংশ নেয় এবং তাদের নেতৃত্ব দেন আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ (রহ.)। অন্যদিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও তার মিত্রদের পক্ষে ৫০০ যুদ্ধজাহাজ অংশ নেয়। নেতৃত্ব দেন সম্রাট দ্বিতীয় কনস্টান্টিন। যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় মুসলিম বাহিনীর হলেও বাইজেন্টাইন বাহিনীর গোলায় তাদের জাহাজগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে বাইজেন্টাইন বাহিনীর চার শর বেশি জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। এই যুদ্ধের ফলে ভূমধ্যসাগরে বাইজেন্টাইন সম্রাটের একক কর্তৃত্বের অবসান হয়।

এরপর উমাইয়া, আব্বাসীয় ও উসমানীয় শাসকরা সামরিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। নৌ-অভিযানে সুদূর পর্তুগাল থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগরের দ্বীপাঞ্চল পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তথ্যসূত্র: প্রবন্ধ: উসমান (রা.)-এর যুগে মুসলিম নৌবাহিনীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, আল মিশকাত, রবিউল আউয়াল ১৪২৬ হিজরি সংখ্যা, জর্দান; মাউদু ডটকম; আল হায়াত ডটকম; উইকিপিডিয়া।